**একুশে পদক ২০১৪ প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৪২০, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

এবারের একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

‘‘একুশে পদক ২০১৪'' প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পদক প্রাপ্তগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আর কয়েক ঘণ্টা পরই আমরা ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সফিউরসহ আমাদের সকল ভাষা শহীদের স্মরণে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবো। আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

একুশ মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি জাতির আত্মত্যাগের এক বীরত্ব কাহিনী। একুশ মানে মাকে মা বলার অধিকার অর্জন। একুশ বাঙালি সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকাচার ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র বজায় রাখার প্রেরণা। একুশ বাঙালি জাতির চেতনা ও গৌরবের উৎস। একুশ আমাদের অহঙ্কার, আমাদের হার না মানা অবিনাশী চেতনার নাম, আমাদের সামগ্রিক পরিচয়। তাই একুশে পদক প্রাপ্তি অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয়।

আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বার বার কারাবরণ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হননি। যিনি আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত এনে দিয়েছেন। সোনার বাংলা গড়ার সূচনা করেছেন।

স্মরণ করছি চার জাতীয় নেতাসহ দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সকল শহীদকে। স্মরণ করছি, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং নির্যাতিত দুই লক্ষ মা-বোনকে।

স্মরণ করছি, কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে। যিনি ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে সরকারী কাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলা ব্যবহারের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্মরণ করছি, তমদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দসহ সকল ভাষা সৈনিককে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলা ভাষার অস্তিত্ব পাওয়া যায় একাদশ শতাব্দীর চর্যাপদে। তখন থেকে বাঙালি জাতি তার অস্তিত্বের জন্য যে সংগ্রাম করে এসেছে তা অনন্য রূপ পেয়েছে একুশের মোহনায় এসে।

বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির মতোই উদার। ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত, পালি, দেশজ সব ভাষাই বাংলায় গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বাংলা ভাষায় এই ঐক্য, সমতা ও ন্যায়ের চেতনা একেবারে উৎস থেকেই আছে। এখানেই বাঙালি জাতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আর বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার মধ্যে এই বাঙালি চেতনা ছড়িয়ে দেন বঙ্গবন্ধু।

একুশের মধ্য দিয়েই সূচিত হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে উদ্ভব হওয়া স্বৈরতান্ত্রিক পাকিস্তানী রাষ্ট্রকাঠামোর নিগড় ভেঙ্গে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তৈরি হয় বাঙালি জাতিস্বত্তার একটি স্পষ্ট রূপরেখা।

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার প্রথম দাবি তোলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর পরই ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ২৯ ফ্রেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস ও ধর্মঘট পালন করে। শুরু হয় পাকিস্তানী শোষকদের নির্যাতন-নিপীড়ন। বাঙালি জাতি এতে উদ্যম হারায়নি।

বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতার উদ্যোগে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ঢাকায় গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এই সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। বঙ্গবন্ধু ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ভাষার দাবির প্রতি জনসমর্থন বাড়াতে বঙ্গবন্ধু সারা দেশ ভ্রমণ করেন। আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রভাষার গুরুত্ব প্রচার করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিনি কারাগারে ছিলেন এবং সেখান থেকেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। যদিও তখন অনেকে দিকভ্রষ্ট হন।

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে ইসলামিক ভাষা হিসেবে প্রচার করে। আর বাংলা হিন্দুদের ভাষা। অবশেষে আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব দেয়। জিন্নাহ'র মতো খাজা নাজিমউদ্দিনও ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় ঘোষণা দেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাঙালি জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনে তীব্রতা আসে।

১১ ফেব্রুয়ারি ‘‘পতাকা দিবস'' পালিত হয়। বঙ্গবন্ধু, মহীউদ্দিন আহমেদসহ অনেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করা হলেও তিনি অনশন অব্যাহত রাখেন। আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে নিয়ে যান।

শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষা ও বাঙালির ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।  তারা ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে।  ২১ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের সভা ছিল। সিদ্ধান্ত হয়, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে প্রাদেশিক পরিষদে স্মারকলিপি পেশ করা হবে। সেলক্ষ্যে ঢাকা শহরের সব স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট গ্রুপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জড়ো হয়। ‘‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'' এই শ্লোগান নিয়ে রাস্তায় নামতেই সরকারী বাহিনী ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

আমাদের সংগ্রামী ও অজেয় তারুণ্য বুকের রক্তের বিনিময়ে সেই আঘাত প্রতিরোধ করেছিল। এভাবে রক্তের আল্পনায় আমরা অর্জন করেছি মাতৃভাষার অধিকার। বিশ্বে ভাষার জন্য এমন অমর আত্মবলিদানের ইতিহাস বিরল।

সুধিমন্ডলী,

একুশের এ অমর ইতিহাসই প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীকার আন্দোলনের। এই ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক চেতনাই বঙ্গবন্ধুকে শক্তি যুগিয়েছে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে। তারই পথ ধরে '৬৬ সালে তিনি ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তালবাহানা করে। আসে ৭ই মার্চ। আসে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা, ‘‘এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।'' শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতা। এভাবেই একুশের চেতনার চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

একুশের সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর আজ বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হচ্ছে। সদ্যপ্রয়াত রফিকসহ কানাডা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালির উদ্যোগ এবং আমাদের সরকারের প্রচেষ্টার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ‘‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাঙালির রক্ত দিয়ে অর্জন করা একুশ আজ বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর ভাষার অধিকার রক্ষার দিন।

বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সুরক্ষা বিধানে ভূমিকা রাখার দায়িত্বও আমরা পেয়েছি। এলক্ষ্যে আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বাংলা ভাষা-বর্ণমালা-সাহিত্য নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-সাহিত্য গবেষণায় এগিয়ে আসার জন্য আমাদের লেখক-গবেষকদের প্রতি আহ্বান জানাই।

সুধিবৃন্দ,

বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ নস্যাৎ করতে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। তারপর থেকে শুরু হয় দেশের অন্ধকারমুখী যাত্রা। বিএনপি-জামাত-শিবির-স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী গোষ্ঠী জোট বাঁধে। তারা দেশের অর্থনীতি, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ঐক্যবদ্ধ সমাজ, বাঙালি সংস্কৃতিসহ মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জনই ধ্বংসের নেশায় মেতে উঠে। যেমনটা করেছিল পাকিস্তানী শাসকরা।

অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি আবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে। তাই তারা এখন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। গণতন্ত্রমনা প্রতিটি বাঙালিকে সংঘবদ্ধভাবে এ ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে হবে। এজন্য সকলকে তৎপর থাকতে হবে।

সরকারের দিক থেকে আমরা যেকোনো রকম ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। রায় কার্যকর করাও শুরু হয়েছে। ধাপে ধাপে সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে। কেউ বাঙালি জাতিকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। সব জঙ্গী, সন্ত্রাসী, নাশকতাকারী এবং তাদের মদদদাতাকে আমরা বিচারের আওতায় আনবো। যতোই হুমকি আসুক না কেন, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। বাঙালি জাতি একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আবারও জেগে উঠেছে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আমরা জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছি। সংবিধান ও গণতন্ত্রকে স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছি। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা, যোগাযোগ, ডিজিটালকরণ প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশ অনেক অগ্রসর হয়েছে।

বিশ্বে বাঙালি জাতি এখন সম্মানের আসনে উপবিষ্ট হয়েছে। আমরা এ অর্জনকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই। সেলক্ষ্যে আমরা ৫ জানুয়ারীর নির্বাচনের পূর্বে ইশতেহার দিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

সুধিমন্ডলী,

আমরা বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা আরও বিকশিত করার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতিমধ্যে আদি নকশা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার সম্প্রসারণ এবং বাংলা একাডেমি থেকে শিল্পকলা একাডেমি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছি। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে এক নবতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে।

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)'র ‘‘স্বদেশী ভাষা'' কবিতায় যেমনটা আছে:

নানান দেশের নানান ভাষা;

বিনা স্বদেশী ভাষা

পুরে কি আশা?

কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর?

ধারা-জল বিনে কভু

ঘুচে কি তৃষা?

একুশে পদকপ্রাপ্ত গুণীজন,

আপনাদের এই পুরস্কার আপনাদের দীর্ঘদিনের সাধনা, মেধা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি। আমরা এমন অনেককেই এ পুরস্কার দিয়েছি যাঁরা আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু বাঙালি জাতি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি মনে করি, আজ থেকে একুশের চেতনা বাস্তবায়নে আপনাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সুধিবৃন্দ,

একুশের চেতনা ও স্বাধীনতার চার মূল স্তম্ভকে যারা অস্বীকার করে তারা একুশের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু। এদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে একুশের চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও স্তরে পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্য দিয়েই আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো।

একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্টজনদের আরেকবার অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

 খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।